দোমোহনিতে দুঃস্বপ্ন

কত মানুষ তখনও ভেতরে আটকে। দোমোহনির কাছে দারিভিজায়। –অর্ঘ্য বিশ্বাস

উপচে পড়ল ‘রক্তহীন’ ব্লাড ব্যাংক

দিব্যেন্দু সিনহা

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : একেই রক্তের আকাল চলছে। করোনা পরিস্থিতি সহ নানা কারণে গত কয়েকদিন ধরে জেলায় সেভাবে রক্তদান শিবির হয়নি। এই পরিস্থিতিতে এত বড় ট্রেন দুর্ঘটনা। খবর পাওয়ার পর থেকেই রক্ত জোগাড়ে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায় জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে। জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্করের কথায়, ‘আগে থেকে কিছু ইউনিট রক্ত ছিল। তবে সমস্ত জায়গায় বলে দেওয়া হয়েছে জরুরি ভিত্তিতে রক্ত দেওয়ার জন্য।’

এদিকে, রেল দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সচেতন নাগরিকরা রক্ত দিতে এগিয়ে আসেন। শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা ব্লাড ব্যাংকে চলে যান রক্ত দেওয়ার জন্য। ছাত্রনেতা শান্তনু অধিকারী বলেন, ‘এসে দেখি ব্লাড ব্যাংকে রক্ত অত্যন্ত কম। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত সদস্যকে ব্লাড ব্যাংকে ডেকে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, যুব সংগঠনের পক্ষ থেকেও রক্ত দেওয়ার জন্য সদস্যদের আহ্বান জানানো হয়। রক্ত দিতে এগিয়ে আসেন রেড ভলান্টিয়াররা, গ্রিন জলপাইগুড়ি সেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি শহরের বহু সাধারণ মানুষও।

যদি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বাসিন্দারা এভাবে এগিয়ে না আসতেন, তবে কী হত পরিস্থিতিটা? ব্লাড ব্যাংক সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, এদিন তাদের হাতে মাত্র ৬০ ইউনিটের মতো রক্ত ছিল। এত বড় দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে ওই রক্ত সামান্য বললেও বেশি বলা হয়। কেবল তা-ই নয়, মজুত থাকা রক্তের মধ্যে আবার ‘বি’ নেগেটিভ ছাড়া আর কোনও গ্রুপের রক্ত ছিল না। এই সামান্য পরিমাণ রক্ত দিয়ে কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হবে, সেটাই একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হাসপাতালের এক কর্মী জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরে বিভিন্ন সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ যদি রক্ত দিতে এগিয়ে না আসতেন তাহলে সম্যায় পড়তে হত। তাঁরা যেমন রক্ত দিতে এগিয়ে এসেছেন, তেমনই সেই রক্ত সংগ্রহ করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালের কর্মীদেরও ডেকে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় ডেকে নেওয়া হয় বাড়ি চলে যাওয়া চিকিৎসকদেরও। বাড়ানো হয় বেডের সংখ্যা।

ব্লাড ব্যাংকের ভেতরে একটি বেডে শুয়ে রক্ত দিচ্ছিলেন জলপাইগুড়ি শহরের মহন্তপাড়ার বাসিন্দা এক মহিলা। তাঁকে কিন্তু কেউ আসতে বলেনি। নিজেই

> রক্তের প্রয়োজন হবে বুঝতে পেরে খবর পাওয়ার পরেই চলে আসি। যদি আমার রক্তে কোনও একজনেরও প্রাণ বাঁচে, সেটাই হবে বড় পাওনা।
>
> – জনৈক রক্তদাতা

এসেছেন। ওই মহিলা বলেন, ‘রক্তের প্রয়োজন হবে বুঝতে পেরে খবর পাওয়ার পরেই চলে আসি। যদি আমার রক্তে কোনও একজনেরও প্রাণ বাঁচে, সেটাই হবে বড় পাওনা।’ একইরকমভাবে রক্ত দিতে এসেছিলেন দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা সুদীপ সাহা এবং বামনপাড়ার বাসিন্দা তুষার ভৌমিক। তাঁরাও জানিয়েছেন দুর্ঘটনায় জখমদের পাশে দাঁড়ানোর কথা।

সাধারণ মানুষের এই বিপুল সাড়া পাওয়ায় ব্লাড ব্যাংকের চিত্রটাই বদলে যায়। বিকাল অবধি যেখানে মাত্র ৬০ ইউনিট অবধি রক্ত ছিল, সেখানে রাত ৯টার মধ্যেই আরও ১২০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়ে গিয়েছে। রক্ত দেবেন বলে শীতের রাতে শারীরিক অস্বস্তি অগ্রাহ্য করে ব্লাড ব্যাংকের বাইরে তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন বহু মানুষ।

চাদরে জখমদের নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সে

কান্নার রোল।। দারিভিজার দুর্ঘটনাস্থলে।

শুভদীপ শর্মা

দোমোহনি, ১৩ জানুয়ারি : চারদিকে শুধুই কান্নার আওয়াজ, সাহায্যের আকুতি। কেউ তখনও দোমড়ানো-মোচড়ানো বগির আড়ালে পড়ে রয়েছেন। কারও জ্ঞান নেই, কারও মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। সুদেব দাস, সুজয় বর্মন, রতন অধিকারীরা প্রথমদিকে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে কোনওমতে মাথা ঠান্ডা রেখে সুদেবরা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। এক-দুজন করে জখমকে উদ্ধার করা শুরু হয়। পরে জখমদের সংখ্যা যে এতটা বেড়ে যাবে তা রতনরা বুঝতে পারেননি।

এদিন বেলা সাড়ে ৪টা থেকে শুরু করে রাত ৯টা পর্যন্ত কয়েকশো জখমকে সুজয়রা জনা ৫০ মিলে কখনও কাঁধ আবার কখনও স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলেছেন। উদ্ধারকাজের প্রথমদিকে স্ট্রেচার ছিল না। সেই অবস্থায় রতনরা নিজেদের গায়ের চাদর খুলে তাতে জখমদের চাপিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। কীভাবে যে এই কাজটা করলাম তা এখন ভেবেই অবাক লাগছে। উদ্ধারকাজের পর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সঞ্জীব রায়, বিনয় বর্মনরা বলছিলেন।

স্থানীয় গৃহবধূ অর্চনা দাস বলছিলেন, ‘চোখের সামনেই একটি বগিকে আর একটি বগির ওপর উঠে পড়তে দেখি। গোটা গায়ে রক্ত মাখা এক যাত্রী আমার চোখের সামনেই লাফ মেরে ওই কামরা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। চলাফেরার তাঁর কোনও ক্ষমতাই ছিল না। কয়েকজনের সাহায্য নিয়ে তাঁকে একটি গাড়িতে তুলে হাসপাতালে পাঠাই।’

সময় গড়াতেই পরিস্থিতির ভয়াবহতা প্রকট হয়। ট্রেনটিতে থাকা বহু যাত্রী জ্ঞানহীন অবস্থায় বগির ভিতরে আটকে ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বহু চেষ্টা করেও তাঁদের উদ্ধার করতে পারছিলেন না। দমকলকর্মীরাও প্রথমদিকে সেভাবে সুবিধা করতে পারছিলেন না। গভীর রাত পর্যন্তও জখম বহু যাত্রী বগিগুলিতে আটকে ছিলেন। তবে উদ্ধারকাজে স্থানীয় বাসিন্দারা এদিন তাঁদের জানপ্রাণ লড়িয়ে দিয়েছেন। অনেক রাত পর্যন্ত এদিন তাঁদের ঘটনাস্থলে দেখা গিয়েছে।

রাম রায়, প্রদীপ মণ্ডল, বিশ্বনাথ পালদের স্মৃতিচারণ, বহু বছর আগে এই এলাকায় একটি ছোট রেল দুর্ঘটনা হয়েছিল। কিন্তু ওই ঘটনার ভয়াবহতা এদিনের ঘটনার মতো ছিল না।

মানবিক মুখ শিলিগুড়ির

‘গ্রিন চ্যানেল’ করে মেডিকেলে আহতদের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : ফের মানবিক মুখ দেখল শিলিগুড়ি।

এই শহর থেকে বৃহস্পতিবারের দুর্ঘটনাস্থলের দূরত্ব প্রায় ৫৭ কিলোমিটার। কিন্তু দুর্ঘটনার পর থেকেই যেভাবে এগিয়ে এল এই শহর, তা অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। দুর্ঘটনার পরই এদিন শিলিগুড়ি কমিশনারেট এলাকার সমস্ত থানার পাশাপাশি ট্রাফিক বিভাগকে সজাগ করে দেওয়া হয়েছিল। একপ্রকার গ্রিন চ্যানেল তৈরি করে আহতদের একে একে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সকলকে মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা পর্যন্ত এদিন শহরে অনেক রাত পর্যন্ত ট্রাফিক ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছিল। রাতে উদ্ধারকার্যে গতি এলে আরও রোগীকে মেডিকেলে রেফার করা হবে ধরে নিয়ে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে বলে শিলিগুড়ির পুলিশ আধিকারিকরা জানান।

এদিকে, বৃহস্পতিবার রাত ১১টার মধ্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের ভাঁড়ার অনেকটাই পূর্ণ। অথচ সন্ধ্যা পর্যন্তও পরিস্থিতি কিন্তু এমনটা ছিল না। সেখানে মাত্র পাঁচ ইউনিট রক্ত মজুত ছিল। বিকেলে ময়নাগুড়ির দোমোহনিতে বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার পরপরই আহতদের কোন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হবে তা নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়। আর তখনই শহর শিলিগুড়ি যেন নতুন করে দিন শুরু করে। বিভিন্ন ছাত্র-যুব সংগঠনের রক্ত সংগ্রহ হয়েছে। আরও সংগ্রহ চলছে।’ মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকের অধিকর্তা মৃদুময় দাস একই কথা জানান।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে হাজির স্বেচ্ছাসেবীরা। ছবি : সূত্রধর

পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের রক্তের ভাঁড়ার পূর্ণ হয়ে ওঠে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেন, ‘একের পর এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সাধারণ মানুষ এসে রক্তদান করেছেন। রাত ১১টা পর্যন্ত প্রায় ৩০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে। আরও সংগ্রহ চলছে।’ মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকের অধিকর্তা মৃদুময় দাস একই কথা জানান।

এদিন বেলা ৫টা নাগাদ বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়। মুহূর্তের মধ্যে সেই খবর উত্তরবঙ্গজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি শিলিগুড়ি থেকেও একের পর এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়। এরই মাঝে খবর আসে, গুরুতর আহতদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হবে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কর্তৃপক্ষ প্রস্তুতি শুরু করে। সবকিছু ঠিক আছে কি না দেখতে গিয়ে দেখা যায়, রক্তের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। মাত্র পাঁচ ইউনিট রক্ত দিয়ে কী করে কাজ চালানো হবে তা নিয়ে চিন্তা বাড়ে।

সেই সময়ই মুশকিল আসান হিসেবে অনেকে মেডিকেলে উপস্থিত হন। মেডিকেলে দ্রুত রক্ত সংগ্রহ শুরু হয়। হাসপাতালের অধিকাংশ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী সংক্রামিত হওয়ায় কর্মীসংকট ছিল। এখানে মুশকিল আসান হিসেবে শিলিগুড়ি হাজির। যুব ভারতী, শিলিগুড়ি ইউনিক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, মাটিগাড়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সহ শহরের একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা মেডিকেলে উপস্থিত হন। গুরুতর আহত সাতজনকে যখন মেডিকেলে নিয়ে আসা হয় তখন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরাও তাঁদের সঙ্গে হাত লাগান। এদিন হাসপাতালের জুনিয়ার চিকিৎসকদের ভূমিকা দারুণ ছিল। কোভিডের ভয় উড়িয়ে দিয়ে শিলিগুড়ি এদিন এভাবেই আহতদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিল। প্রয়োজনে শিলিগুড়ি এমন বার্তা আগেও দিয়েছে। এদিনও দিল। এই সুবাদে শহরে নতুন করে আশার আলো ছড়াল।

স্টেশন থেকে আত্মীয়রা ছুটলেন দুর্ঘটনাস্থলে

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার পড়ন্ত বিকেলে গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার খবর আসতেই বদলে গেল নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনের পরিবেশ। কারণ এই স্টেশনে তখন বেশ কিছু মানুষ এই ট্রেন আসার অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের নিতে স্টেশনে এসেছিলেন। কিন্তু হঠাৎই পরিস্থিতি বদলে গেল। যাঁরা বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা সেই গাড়ি নিয়ে ছুটলেন দুর্ঘটনাস্থলে। যাঁরা গাড়ি নিয়ে আসেননি, তাঁরাও অনেকে তাতে যোগ দিলেন। সবারই চোখেমুখে তখন উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের ছাপ।

এদিকে, ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটার পর নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হয় হাওড়াগামী সরাইঘাট এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদাগামী পদাতিক এক্সপ্রেসকে। পরে দুটো ট্রেনকেই মাথাভাঙ্গা হয়ে ঘুরপথে চালানো হয়। এই ট্রেন দুটো ছাড়তেই স্টেশন ধীরে ধীরে নির্জন হয়ে পড়ে। কারণ অন্য যে ট্রেন আসার কথা ছিল, সেই সমস্ত ট্রেন আলিপুরদুয়ার জংশন হয়ে চলার কথা রেল মাইকযোগে ঘোষণা করে। তাই স্টেশনে থাকা অন্য যাত্রীরা স্টেশন ছাড়তে শুরু করেন। যাঁরা আত্মীয়দের নিতে এসেছিলেন, তাঁরাও চলে যান। লোকজন না থাকায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অনেকেই দোকান বন্ধ করে দেন। কারণ ট্রেন না থাকলে, লোকজন না থাকলে তাঁরা আর কী করবেন। একেবারে লকডাউনের সময় যে পরিস্থিতি ছিল, সেটাই যেন ফিরে আসে।

জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার বহু মানুষ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভিনরাজ্যে কাজ করতেন। করোনার জন্য ভিনরাজ্যে কিছুদিন কাজ না থাকায় অনেকেই বাড়ি আসছিলেন। অনেকে আবার পৌষ-পার্বণের জন্য বাড়ি ফিরছিলেন। আবার অসমের কিছু মানুষও এই ট্রেনে ছিলেন। তাঁরা ভোগালি বিহু পার্বণের জন্য বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু দুর্ঘটনার ফলে সবই আটকে যায়।

এদিকে, দুর্ঘটনার পর কোচবিহার জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর, জেলা পুলিশের তরফে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। কোচবিহার জেলা থেকে সবমিলিয়ে ১৬টি অ্যাম্বুল্যান্স, ট্রমা কেয়ার অ্যাম্বুল্যান্স, মেডিকেল টিম, খাবারের প্যাকেট সহ অন্য সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে আহতদের।

জ্ঞানেশ্বরী ষড়যন্ত্রের ছায়া দেখছেন অনেকে

বিশেষ সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : ২০১০ সালের ২৭ মে দিনটিও ছিল বাংলা মতে বৃহস্পতিবার। রাত ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। সেই ভয়ংকর নাশকতার মামলা এখনও চলছে মেদিনীপুর আদালতে।

এতদিনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, ওই ঘটনাটি কোনও দুর্ঘটনা ছিল না। যে জায়গাটিতে মাওবাদীরা ফিশপ্লেট খুলে দিয়েছিল তার উপর দিয়েই ইঞ্জিন সহ জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের দুটি বগি পার হয়ে গিয়েছিল। তারপরের বগিগুলি কাত হয়ে পড়ে যায় পাশের রেললাইনের উপর।

ময়নাগুড়ির ঘটনার কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই ওই ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব প্রাথমিক পর্যায়ে গিয়ে পড়েছিল ঝাড়গ্রাম জিআরপির উপর। পরের দিন রাজ্য পুলিশের তদানীন্তন ডিজি ভূপিন্দর সিং ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘোষণা করেছিলেন, ওই ঘটনার তদন্ত করবে সিআইডি। এর দু'দিন বাদেই ওই ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব গিয়ে বর্তায় সিবিআইয়ের উপর। সিবিআই ওই ঘটনার তদন্তের ভার হাতে নেওয়ার আগেই রেল পুলিশ ধরতে পেরেছিল দেবেন মাহাতোকে। দেবেন পুলিশের জালে ধরা পড়ে যাওয়ার পরপরই একে একে প্রকাশ হয়ে পড়ে পুরো ষড়যন্ত্র। জানা যায়, ওই চক্রান্তের মধ্যমণি ছিলেন বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম রাজ্য সম্পাদক ছত্রধর মাহাতো।

ময়নাগুড়ি কাণ্ডে রেল পুলিশ ও রেলের অফিসার ও কর্মীরা বর্তমানে উদ্ধারকাজে ব্যস্ত। এরপর তাঁরা হয়তো তদন্তের কাজে হাত দেবেন। আর তখনই হয়তো ধরা পড়বে ময়নাগুড়ির কাণ্ডের সঙ্গে জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের মিল আছে কি না।